শাশ্বত

গুরুপূর্ণিমা

স্বামী কৃতার্থানন্দ

“যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎ সাক্ষাৎকরণাৎ ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে॥”

—সত্যবস্তুকে অবলম্বন করেই যাঁর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, অথচ তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বস্তুকে মিথ্যা বলে মনে হয়, যিনি আশ্রিতদের ‘তুমিই সেই ব্রহ্ম’—এই বেদবাক্যের দ্বারা সরাসরি জ্ঞান দান করেন, যাঁর সাক্ষাতের ফলে এই সংসারসাগরে আর ফিরে আসতে হয় না, শ্রীগুরুরূপী সেই শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে প্রণাম জানাই।

সনাতন ধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে ‘গুরু’ কথাটি সভ্যতার উন্মেষের সময় থেকেই প্রচলিত। লৌকিক অর্থে ‘গুরু’ শব্দের অর্থ শিক্ষক বা আচার্য হলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। জাগতিক বা অপরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য মানুষ শিক্ষকের কাছে যায়; আর পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যে গুরুর কাছে যায়। এই দুরকমের গুরুর প্রকৃতিতে একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। পরাবিদ্যার গুরুর লৌকিকবিদ্যায় পাণ্ডিত্য না থাকলেও ক্ষতি নেই; আর জাগতিকবিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষকের, অপরকে বোঝানোর জন্য, ঢাল-তরোয়াল-বর্মের মতো লড়াইয়ের হাতিয়ার ভীষণ দরকার। আর একটি দিক হল, অপরাবিদ্যার যিনি গুরু হবেন, তাঁর শুধু সেই বিষয়টিতে জ্ঞানের গভীরতা দ্রষ্টব্য—তাঁর চরিত্র বা ব্যক্তিজীবন কেমন তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। আর আধ্যাত্মিক পথের গুরুর জীবনের প্রতিটি পর্বই হল তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি; কারণ আধ্যাত্মিকজীবন সমগ্র ব্যক্তিত্বটি নিয়ে গঠিত—তাতে এতটুকু ছিদ্র থাকলে চলবে না। আধ্যাত্মিক গুরু সব কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে অপাপবিদ্ধ হয়ে বিচরণ করেন, কারণ ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি,’ আর ব্রহ্মের স্বরূপই হল নিত্য-শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ-অকামী ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে গুরুর স্থান মাতাপিতারও ওপরে, কেন-না পিতামাতা জন্ম দেন ও লালন-পালন করেন; আর গুরু বিদ্যাদান করে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ রাখেন, যাতে মনুষ্যজন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সার্থক হয়—মানুষ পশুতে পরিণত না হয়। শাস্ত্রে চাররকম দানের বিধান আছে। উৎকর্ষের ক্রম অনুযায়ী সেগুলিকে সাজালে হবে—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান। অন্নদান মানে খাওয়া-পরা ইত্যাদি জোগানো, যা পিতামাতার কাজ; প্রাণদান হল রোগী-আর্তের সেবা যা চিকিৎসকের কাজ; বিদ্যাদান লৌকিক শিক্ষকের কাজ; আর জ্ঞানদান মানে অধ্যাত্মবিদ্যা দান, যা একমাত্র গুরুরই কাজ। এদিক দিয়ে দেখলে মানুষের জীবনে সর্বোচ্চ স্থান গুরুর।

গুরুপূর্ণিমাকে ব্যাসপূর্ণিমা বলা হয়, কারণ অনেকের মতে এটি ব্যাসদেবের জন্মতিথি, যিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামেও পরিচিত। তবে এ-বিষয়ে মতানৈক্য আছে, কারণ দক্ষিণভারতে ব্যাসদেবের জন্মতিথি অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় পালিত হয়।

ভারতে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক মা ও সন্তানের নাড়ির সম্পর্কেরও ঊর্ধ্বে। প্রাচীন ভারতে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবা সন্তানকে গুরুগৃহে বাস করতে পাঠাতেন। তখন থেকে শিশুটি গুরুকেই পিতা ও গুরুপত্নীকে মাতা বলে জানত। পঁচিশ বছর বয়সে পাঠক্রম সমাপ্ত করে সে হয় গুরুর কাছেই থেকে যেত গভীরতর বিদ্যালাভার্থে, কিংবা মা-বাবার কাছে ফিরে গিয়ে সংসারধর্ম পালন করত। বিশ বছরের একটানা গুরুগৃহবাস শিষ্যকে জীবনপথের রসদ ও পুষ্টি জোগাত। গুরুর কাছে থেকে শিষ্য শিখত কীভাবে শ্রদ্ধা আনতে হয়, কীভাবে প্রতিটি কাজ গুরুসেবার অঙ্গে পরিণত করতে হয়, মনে সংশয় উঠলে কীভাবে তার নিরাকরণ করতে হয়, কীভাবে ভয়কে জয় করতে হয়। শাস্ত্রমাতা যেন বিভোর হয়ে এ-ব্যাপারে কতই না বিধি-উপদেশ দিয়েছেন! গীতা বলছেন, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'—প্রণাম, পরিপ্রশ্ন (নানাদিক থেকে সেই তত্ত্বের অন্বেষণে প্রশ্ন) ও সেবার মাধ্যমে তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছ থেকে সেই তত্ত্বকে জানো। মুণ্ডক উপনিষদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'— পরমতত্ত্ব জানার জন্য শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছেই যেতে হবে।

গুরুগীতায় আছে, 'গু' মানে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দটি নাশ করা বোঝায়। তাহলে গুরু তিনিই, যিনি অজ্ঞান বা তামসিকতার অন্ধকারকে নাশ করে প্রকৃত জ্ঞানের আলোক শিষ্যের অন্তরে জ্বালিয়ে দেন।

তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায়, আসলে গুরু বলতে একটি ভাব বা অবস্থাকেই নির্দেশ করা হয়, কোনও মানুষকে নয়। এই ভাবটির তিনটি স্তরে স্ফুরণ হয়ে থাকে। প্রথম হল মানুষগুরু। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধক নিজের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ সীমাবদ্ধতা দেখতে পায়; তাই একজন পথনির্দেশকের প্রয়োজন হয় তার, যিনি ওই সীমাবদ্ধতাগুলিকে অতিক্রম করে নিজ মহিমায় ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। সাধকের মনে হয়, সেই 'মানুষগুরুর' সঙ্গে তার পাহাড় ও সর্ষের দানা বা সূর্য ও জোনাকির আলোর মতো বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তারপর গুরুর কৃপায় ভর করে সে যতই সাধনপথে এগিয়ে যায়, ততই অনুভব করতে থাকে, ওই মানুষগুরুই হৃদয়ে অন্তর্যামী হয়ে রয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন শিষ্যের ব্যক্তিত্বের সবকিছু। আসলে সাধকের মনই অত্যন্ত শুদ্ধ হয়ে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তখন বাইরের গুরুর প্রয়োজন গৌণ বোধ হয়—এমনকি তাঁর প্রয়াণ হলেও শিষ্য তাঁর বিয়োগব্যথা অনুভব করে না; কারণ তিনি যে এখন তার আরও কাছে নিবিড়ভাবে এসে বসেছেন হৃদয়ের আসনে! মন তখন গুরুর ভূমিকা নিয়ে প্রতি পদে শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এ-মন কিন্তু আগেকার সেই খেয়ালি, সংশয়ী, সুকর্ম-কুকর্মে বাঁধা পাগল মন নয়। এখন এই মনের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায়, একে বিশ্বাস করা যায়। এই অবস্থায় মন যেন সাধকের প্রতি দয়াপরবশ হয়। এই দয়া না আসা পর্যন্ত বাইরের গুরুর দয়া, সৎসঙ্গ ইত্যাদি যতই থাকুক না কেন, জীবের একেবারেই মুক্তি নেই। বৈষ্ণবশাস্ত্রে একথা ছড়ার আকারে বলা হয়েছে—"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল/একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।" এখানে 'এক' কথার অর্থ নিজের মন।

এইভাবে বিশুদ্ধমনে সাধনায় আরও এগিয়ে গিয়ে তবে সাধক উপলব্ধি করে যে, আসল গুরু হলেন সৎ বা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী; চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ; এবং অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের এক অনন্ত খনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, সচ্চিদানন্দই প্রকৃত গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যন্ত সুন্দর জাগতিক দৃষ্টান্ত টেনে এনে এই সত্যটি আমাদের বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাবেকি বাড়িগুলিতে দেখা যায় সিংহের মুখওলা নল দিয়ে ছাদে বা বারান্দায় জমা জল বেরিয়ে আসছে। শিশুরা ভাবে হয়তো সিংহের মুখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে। কিন্তু আসল জল রয়েছে সেই অনন্ত আকাশে মেঘের আশ্রয়ে, সেখান থেকে বর্ষণ হয়ে এতটুকু ছাদে জল জমে ওই নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। ঠিক ওইভাবে সচ্চিদানন্দ গুরুর কৃপা মানুষগুরুর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় শিষ্যে; তা শিষ্যকে উদ্দীপ্ত করে ও তার অন্তরের অন্তর্যামী গুরুকে জাগিয়ে তোলে। এইভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অনবচ্ছিন্ন ধারার মতো গুরুর কৃপা কাজ করে চলে।

আধ্যাত্মিক পথে চলতে হলে সত্যিই কি গুরুর

দরকার? গুরু যে-মন্ত্র দেন ওইরকম অনেক মন্ত্রই তো বইতে লেখা থাকে, সেগুলো নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করলে হয় না? গুরুর প্রকৃত ভূমিকাটি কী? কেনই বা গুরুকে দক্ষিণা দিতে হবে? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র বলে পরিচিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক জগতের এক দিক্‌পাল ছিলেন। উল্লিখিত প্রথম প্রশ্নের জবাব তিনি দেন এইভাবে—‘‘একজন পকেটমার হতে গেলেও গুরুর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া চাই, আর আধ্যাত্মিক গুরু করতে গেলেই যত গোল!’’ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, দীক্ষার মন্ত্রটি শুধু কতকগুলি শব্দের সমষ্টি নয়, এক নির্দিষ্ট দেবতা বা ইষ্টদেবতার দ্যোতক সজীব, প্রাণবন্ত অক্ষরমালা। মন্ত্রের তিনটি ভাগ—বীজ, শক্তি ও নাম। মন্ত্র এই তিনটিরই জ্ঞাপক। এর মধ্যে শক্তি ভাগটি মন্ত্রে প্রাণসঞ্চার করে। আমার গুরু তাঁর গুরুর কাছে এবং তিনিও তাঁর গুরুর কাছে ওই একই মন্ত্র পেয়ে জপ (অর্থ চিন্তা করতে করতে বারবার উচ্চারণ করে যাওয়া ও ইষ্টে মন স্থির রাখা) করে করে ওই মন্ত্রকে পরম্পরাগতভাবে সজীব করে গেছেন। এইভাবে মন্ত্রের শক্তি এক আধার থেকে অন্য আধারে সঞ্চারিত হতে থাকে। বইয়ে লেখা মন্ত্র মুখস্থ করে তা কি হতে পারে কখনও? সে যে পবিত্র-অপবিত্র-নির্বিশেষে সকলেরই চোখে পড়ছে! অপরদিকে মন্ত্র কানে কানে বলা হয় সাধক মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেওয়ার পর। অনেক সময় মুখেও উচ্চারণ করা হয় শ্রোতাদের শ্রুতিগম্য হওয়ার জন্য। কিন্তু তা কখনই লেখা হয় না সাধারণের জন্য। কথা হল, মন্ত্র যত গোপন থাকবে, তার সূক্ষ্মতা ও পবিত্রতা ততই বাড়বে। তাই জপের সময় ঠোঁট পর্যন্ত না নাড়িয়ে মন্ত্র মনে মনে আউড়ে যেতে অনেক গুরুই নির্দেশ দেন।

এবার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আসা যাক। অনেকের মতে গুরুর ভূমিকাটি যেন ঘটকের, অর্থাৎ যিনি বিবাহ সম্পাদন করতে পাত্রপাত্রীপক্ষের মধ্যস্থতা করেন। প্রকৃতপক্ষে গুরুর ভূমিকা কিন্তু ঠিক তেমনটি নয়। ঘটক পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ তথা বিবাহ ঘটিয়ে নিজের দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হন, তারপর তাঁর আর কোনও ভূমিকাই থাকে না। কিন্তু গুরু স্বয়ং শিষ্যের হাত ধরে অনেকরকম বন্ধুর-ভঙ্গুর পথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ইষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেন এবং নিজে ইষ্টে লয় হয়ে যান। ব্যাপারটি স্থূলভাবে দেখা যায় না, কারণ গুরু শিষ্যের অন্তঃকরণে বসে কাজগুলি করেন। মানুষ স্থূলবুদ্ধিতে সন্দেহের সঙ্গে ভাবে, মানুষগুরুর পক্ষে কীভাবে এসব সম্ভব? এটি সম্ভব হয় শুধু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসসম্পন্ন ঐকান্তিক সাধকের ক্ষেত্রে। বাকিরা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাবে সংশয়-দ্বিধাপূর্ণ জীবন কাটায়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা উল্লেখযোগ্য—‘‘মানুষগুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।’’

এবার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর। ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে একটা অলিখিত বিধান প্রচলিত যে, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। বৈদিক কর্মকাণ্ডে নানারকম বিধান আছে; যেমন তুমি যদি পৃথিবীর সবকিছুর রাজা হতে চাও, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করো। যজ্ঞ কথাটির অর্থই হল, একটা বড়ো জিনিস পাওয়ার জন্য ছোটো কিছু ত্যাগ করা। তা আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেতে যদি একটু দক্ষিণা দিতেই হয়, সেটা কি অন্যায়?

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক। আমাদের সকলের অন্তরেই পূর্ণতা, জ্ঞান রয়েছে। তাহলে গুরুর কী প্রয়োজন? গুরুর প্রয়োজন শুধু সেই সুপ্ত জ্ঞানকে অরণিকাঠের মতো ঘষে ঘষে তার আগুনপ্রকাশে সাহায্য করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে গুরু তিন রকমের হন। তিনি দৃষ্টান্ত এনেছেন উত্তম, মধ্যম ও অধম বৈদ্যের। অধম বৈদ্য শুধু রোগীকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে বলে যান—‘খেয়ো হে’; সেইরকম অধম থাকের গুরুও মন্ত্র দিয়ে ও পদ্ধতি দেখিয়ে চলে যান, শিষ্যের আর কোনও খোঁজ নেন না। মধ্যম বৈদ্য রোগীকে ওষুধ খাওয়াবার জন্য অনেক করে বোঝান; ঠিক সেভাবে মধ্যম শ্রেণির গুরুও শিষ্যকে মিষ্টি কথায় অনেক বোঝান সাধনপথে লেগে থাকবার জন্য। আর উত্তম বৈদ্য মিষ্টি কথায় কাজ হল না দেখে রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে জোর করে ওষুধ গিলিয়ে দেন; উত্তম স্তরের গুরুও শিষ্য কথা শোনে না দেখে অনেক সময় কঠিন শাসন করেন তার মঙ্গলের জন্য, এমনকি মারধোর করাও

আশ্চর্য নয়। তাতে তামসিকতার মেঘ কেটে গিয়ে জ্ঞানসূর্যের প্রকাশ হয়।

আধ্যাত্মিকতার সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য গুরুকৃপার প্রয়োজন প্রতি পদে। গুরুকৃপা যে কখন কার ওপর এবং কীভাবে নেমে আসবে, তা বলা কঠিন। সাধক নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও সাফল্য না আসতে পারে। এই কৃপা নিয়ে ভক্তবৃন্দের মধ্যে কৌতূহলের সীমা নেই। ঐহিক জীবনে একটু অনুকূল পরিবেশ হলেই সাধক বলেন, ‘‘আহা, এসব শুধু গুরুকৃপায় হল!’’ কোনও দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেলেই তা ‘গুরুকৃপা’! তাহলে যদি প্রতিকূল পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা একের পর এক বিধ্বস্ত করতে থাকে, তার মানে গুরুর কৃপা কাজ করছে না? আসলে আধ্যাত্মিক জগতে ‘কৃপা’ কথাটির তাৎপর্য একটু অন্য। মহর্ষি রমণ এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, সাধক যখন ঐকান্তিক ও পবিত্রভাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে সাধনা চালিয়ে যায়, তখন আসলে গুরুকৃপাই তার অন্তরে প্রচেষ্টার রূপ নিয়ে তাকে সবকিছু থেকে রক্ষা করে এবং এগিয়ে যাওয়ার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। গুরুর কৃপাবাতাস সর্বদাই বয়ে চলেছে; যে ঠিকভাবে পাল তুলে দেবে, সে-ই তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। তাই মনরূপ মাঝিকে ‘পাকা’ অর্থাৎ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। গুরুকৃপা আবার সাধককে প্রতিকূল পরিবেশে ফেলে তার শক্তি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। গুরু স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃপা বিতরণ করে যান। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে আচার্য শংকর লিখেছেন, সংসারদুঃখে জর্জরিত ব্যাকুল শিষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গুরু করুণারসে দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিষ্যকে অভয় দেন। আচার্য এই স্বতঃস্ফূর্ততাকে বোঝাতে সংস্কৃতে ‘সহসা’ কথাটি ব্যবহার করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এইভাবেই বিহারের অখ্যাত গ্রাম থেকে আগত লাটুকে ভৃত্য হয়ে আসতে দেখে হঠাৎই ঈশ্বরীয় উদ্দীপনাময় হয়ে গিয়ে তাকে ছুঁয়ে দিয়ে কৃপাসঞ্চার করেন। বালক লাটু সেই স্পর্শে অন্তরে অবিচ্ছিন্ন আনন্দের সাম্রাজ্যের সন্ধান পেয়ে কয়েক ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকে। উচ্চকোটি গুরুরা কৃপা করে অযাচিতভাবে শিষ্যের পাপ নিজের শরীরে গ্রহণ করেন ও সেই পাপগত দুঃখ ভোগ করেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ একবার উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়ে স্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হয়েও দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন এবং শিষ্যবৃন্দকে মায়ের পাদস্পর্শ করতে বারণ করেছিলেন, যাতে করুণায় মা নিজের শরীরে সকলের পাপ টেনে নিতে না পারেন।

যাই হোক, বহু প্রচেষ্টার ফলে শিষ্য পথের শেষে পৌঁছে বুঝতে পারে, এ-পর্যন্ত গুরুর কৃপা সবসময় তার সঙ্গে বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর মতো চলছিল। সংসারে যখন সাহায্য করার জন্য কেউ হাত বাড়াতে সাহস করে না, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় জর্জরিত মানুষ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, ঠিক তখনই করুণাধারায় এই গুরুকৃপা নেমে আসে; শিষ্য না চাইলেও আসে, কারণ গুরু মন্ত্রের মাধ্যমে শক্তিসঞ্চারের সময় থেকেই অলিখিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বামীজী এই ভাবটি তাঁর অবিস্মরণীয় ও নিজ জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট একটি ইংরেজি কবিতার (In search of God) কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে সুদক্ষ শিল্পীর মতো এঁকেছেন। তার অনুবাদটি এখানে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক হবে : ‘‘ঘোর দুর্বিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি,/ অবসন্ন প্রাণ, ক্লান্ত ও কাতর,/ যখন প্রকৃতি আমাকে চূর্ণ করে/ ক্ষমাহীন তার নিয়মে—/ শুনেছি তোমার স্বর তখনি হে প্রিয়!/ বলেছ গোপনে মৃদুভাষে ‘আমি এসেছি’,/ জেগেছি সেই স্বরে; তোমার সঙ্গে/ সহস্র মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়।’’

এ-অঙ্গীকার হল গভীর প্রেমের পরিণাম, যা মাতাপিতাও করতে পারেন না। তাই স্বামীজী জীবনে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বলেছিলেন, ‘‘একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের ওই পাগলা বামুনই ঠিক ঠিক ভালবাসতে জানে, যার কাছে মা-বাবার ভালবাসাও তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই তনু, মন, প্রাণ সব ওই পাগলা বামুনের কাছে চিরতরে বিকিয়ে দিয়েছি—এ হৃদয়ে আর কারও স্থান হবে না; আমি তাঁর দাসানুদাস।’’

আমাদের প্রার্থনা, সবার গুরু সেই সচ্চিদানন্দ আমাদের অন্তরের গুরুকে প্রচোদিত করে আমাদের সৎপথে চালিত করুন, আমাদের মনুষ্যজন্ম সফল করুন। ✠